জয় বাংলা

আল্লাহ্ সর্বশক্তিমান

জয় বঙ্গবন্ধু

১৭ মে
দেশরত্ন জননেত্রী শেখ হাসিনার
৪২তম স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
বঙ্গভবন, ঢাকা।

০৩ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৯
১৭ মে ২০২২

বাণী

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সভাপতি ও গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ৪২তম স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস উপলক্ষ্যে আমি তাঁকে প্রাণঢালা শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাচ্ছি।

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট কালরাতে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতাবিরোধী ঘাতকচক্রের হাতে সপরিবারে নির্মমভাবে নিহত হন। এ সময় তাঁর দুই কন্যা শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানা তৎকালীন পশ্চিম জার্মানিতে অবস্থান করায় তাঁরা প্রাণে বেঁচে যান। কিন্তু তাঁরা দেশে ফিরতে পারেন নি। বাবা, মা, ভাইসহ আপনজনদের হারানো বেদনাকে বুকে ধারণ করে পরবর্তীতে ৬ বছর লন্ডন ও দিল্লীতে চরম প্রতিকূল পরিবেশে নির্বাসিত জীবন কাটাতে হয়। ১৯৮১ সালে ১৪-১৬ ফেব্রুয়ারি ইডেন হোটেলে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের ত্রয়োদশ জাতীয় কাউন্সিল অধিবেশনে শেখ হাসিনার অনুপস্থিতিতে সর্বসম্মতিক্রমে তাঁকে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভাপতি নির্বাচিত করা হয়। এ ছিল বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের তৎকালীন নেতৃবৃন্দের এক দূরদর্শী ও সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত। নানা উৎকণ্ঠা ও অনিশ্চয়তার মধ্যে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে তিনি স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের সিদ্ধান্ত নেন। বৈরি আবহাওয়া সত্ত্বেও ১৯৮১ সালের ১৭ মে ঢাকা কুর্মিটোলা বিমান বন্দরে তাঁকে স্বাগত জানাতে লাখো মানুষের ঢল নামে। সেদিন বাংলার জনগণের অকৃত্রিম ভালোবাসায় তিনি সিক্ত হন। আবেগাপ্লুত কণ্ঠে সেদিন তিনি বলেন, "সব হারিয়ে আজ আপনারাই আমার আপনজন।... বাংলার মানুষের পাশে থেকে মুক্তির সংগ্রামে অংশ নেয়ার জন্য আমি এসেছি। আওয়ামী লীগের নেতা হওয়ার জন্য আসিনি। আপনাদের বোন হিসেবে, মেয়ে হিসেবে বঙ্গবন্ধুর আদর্শের আওয়ামী লীগের একজন কর্মী হিসেবে আমি আপনাদের পাশে থাকতে চাই।" শেখ হাসিনার স্বদেশ প্রত্যাবর্তন বাংলাদেশের গণতন্ত্রের ইতিহাসে একটি মাইলফলক। তাঁর ঐতিহাসিক স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের মধ্য দিয়ে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, স্বাধীনতার মূল্যবোধ ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পথ সুগম হয়।

শেখ হাসিনা দেশে ফিরে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের আন্দোলন শুরু করেন। এরই ধারাবাহিকতায় ৯০'র গণআন্দোলনের মাধ্যমে স্বৈরাচারের পতন হয়, বিজয় হয় গণতন্ত্রের। ১৯৯৬ সালের ১২ জুন সাধারণ নির্বাচনে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ বিপুল ভোটে জয়লাভ করে এবং শেখ হাসিনার নেতৃত্বে সরকার গঠিত হয়। এ সময় পাহাড়ি-বাঙালি দীর্ঘমেয়াদী রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ বন্ধে পার্বত্য শান্তিচুক্তি এবং প্রতিবেশী ভারতের সাথে গঙ্গা পানিবণ্টন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ২০০৮ সালের ২৯ ডিসেম্বর সাধারণ নির্বাচনে তাঁর নেতৃত্বে ১৪ দলীয় জোট সরকার ক্ষমতায় আসে এবং জনগণের কল্যাণে নানামুখী কর্মসূচি গ্রহণ করে। বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচারের রায় কার্যকর করা হয়। গণতন্ত্র, মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, নারীর ক্ষমতায়ন, বিদ্যুৎ, তথ্যপ্রযুক্তি, গ্রামীণ অবকাঠামো, বৈদেশিক কর্মসংস্থানসহ নানা কর্মসূচি বাস্তবায়নের মাধ্যমে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বলতর হয়। ২০১৪ সালের ৫ জানুয়ারি সাধারণ নির্বাচনে শেখ হাসিনার নেতৃত্বে জোট সরকার পুনরায় ক্ষমতায় এসে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার কার্যক্রম শুরু ও রায়ের বাস্তবায়নসহ সমুদ্রে বাংলাদেশের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠা, ভারতের সাথে দীর্ঘদিনের অমিমাংসিত স্থল সীমানা নির্ধারণ তথা ছিটমহল বিনিময় চুক্তি সম্পাদনের মাধ্যমে সরকার গণমানুষের কল্যাণে নিরলস প্রয়াস চালান। ২০১৮ সালের ৩০ ডিসেম্বর সাধারণ নির্বাচনে শেখ হাসিনার নেতৃত্বে জোট সরকার টানা তিনবার ক্ষমতায় এসে ইতিহাস সৃষ্টি করেছে এবং সাফল্যের সাথে সরকার পরিচালনা করছে।

নানা প্রতিকূলতা সত্ত্বেও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদৃষ্টি, বলিষ্ঠ নেতৃত্ব এবং জনকল্যাণমুখী কার্যক্রমে দেশ আজ এগিয়ে যাচ্ছে। ক্রমাগত প্রবৃদ্ধি অর্জনসহ মাথাপিছু আয় বাড়ছে, কমছে দারিদ্র্যের হার। নিজস্ব অর্থায়নে নির্মাণাধীন পদ্মাসেতুর কাজ প্রায় শেষের পথে। মেট্রোরেল, পায়রা গভীর সমুদ্র বন্দর, কর্ণফুলী টানেল, হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরের তৃতীয় টার্মিনাল ও রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের কাজও নিরবচ্ছিন্নভাবে এগিয়ে যাচ্ছে। দেশকে একটি সুখী-সমৃদ্ধ সোনার বাংলায় পরিণত করতে তিনি 'রূপকল্প ২০২১' এর সফল বাস্তবায়নের পথ ধরে 'রূপকল্প ২০৪১' ও 'ডেল্টা প্ল্যান-২১০০' এর মতো দূরদর্শী কর্মসূচি গ্রহণ করেছেন। গণতন্ত্র, উন্নয়ন ও জনগণের কল্যাণে শেখ হাসিনার এসব যুগান্তকারী কর্মসূচি বিশ্বে আজ রোল মডেল হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। বাংলাদেশ ইতোমধ্যে স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশে উন্নীত হয়েছে। গত বছর আমরা দেশে-বিদেশে সাড়ম্বরে উদ্‌যাপন করেছি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী ও বাংলাদেশের স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী। এসব অনুষ্ঠানে বিভিন্ন দেশের সরকার ও রাষ্ট্রপ্রধানদের উপস্থিতি এবং শুভেচ্ছা বার্তা প্রেরণ দেশের ভাবমূর্তিকে উজ্জ্বল করেছে। 'মুজিববর্ষ' উপলক্ষ্যে দেশের ভূমিহীন ও গৃহহীন বিশাল একটি জনগোষ্ঠীর আবাসনের ব্যবস্থা করা হচ্ছে যা গোটা বিশ্বে ছিন্নমূল ও অসহায় মানুষের দারিদ্র্য বিমোচনের ধারণার ক্ষেত্রে একটি নতুন ধারা সৃষ্টি করেছে। মহামারি করোনার প্রভাবে গোটা বিশ্বের অর্থনীতিতে নেতিবাচক প্রভাব পড়লেও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সময়োচিত ও সাহসী পদক্ষেপের ফলে করোনার প্রভাব মোকাবিলা করে সরকার অর্থনীতির প্রবৃদ্ধি ধরে রাখতে সক্ষম হয়েছে। টেকসই এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন নিশ্চিতকল্পে সরকারের নানামুখী আর্থসামাজিক ও বিনিয়োগধর্মী প্রকল্প, কর্মসূচি এবং কার্যক্রম গ্রহণের ফলে দেশের অর্থনীতি ঘুরে দাঁড়িয়েছে। টেকসই উন্নয়নের এ অগ্রযাত্রা অব্যাহত থাকলে ২০৪১ সালের মধ্যেই বাংলাদেশ বিশ্বের বুকে একটি উন্নত-সমৃদ্ধ দেশ হিসেবে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবে, ইনশা আল্লাহ।

আমি বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস উপলক্ষ্যে সরকারের অব্যাহত সাফল্যসহ তাঁর নিজের ও পরিবারের সকল সদস্যের সুস্বাস্থ্য, দীর্ঘায়ু, সুখ-সমৃদ্ধি ও কল্যাণ কামনা করছি।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ আবদুল হামিদ

দুঃখে যেন করিতে পারি জয়

আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক

আজ ১৭ই মে। ১৯৮১ সালের এ দিন অর্থাৎ ১৭ই মে তারিখে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা নির্বাসিত জীবন থেকে দেশে ফিরে আসেন। স্বদেশে ফিরে আসা কোন সাধারণ ফিরে আসা ছিলনা। সে সময় দেশের সামরিক সরকারের ছত্রচ্ছায়ায় শেখ হাসিনা আগমন প্রতিরোধ কমিটিও গঠিত হয়েছিল।

সপরিবারে বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের পর বাধ্য হয়ে দীর্ঘ ছয় বৎসর প্রবাসে নির্বাসিত জীবনযাপন করে শেখ হাসিনার এ স্বদেশ প্রত্যাবর্তন বাংলাদেশের ইতিহাসে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। এক এগারোর সেনাশাসিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলেও শেখ হাসিনাকে দেশে ফিরতে বাধা দেয়া হয়েছিল। ২০০৭ সালের ৭ই মে তারিখে তিনি ঝুঁকি নিয়ে স্বদেশে ফিরে আসেন। তাই ৭ই মে তারিখটিও বাংলাদেশের ইতিহাসে সংযুক্ত হয়ে আছে।

পঁচাত্তরের ১৫ই আগস্ট তারিখে বোন শেখ রেহানা, স্বামী ড. এম এ ওয়াজেদ মিয়া ও দু'সন্তান সজীব ও পুতুলসহ শেখ হাসিনা বেলজিয়ামে অবস্থানরত অবস্থায় সপরিবারে বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের সংবাদ পান। তিনি স্বল্পকালীন সফরে সে সময় বেলজিয়ামে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত জনাব সানাউল হকের বাসায় বসেই এই মর্মান্তিক দুঃসংবাদটি শুনেন।

ঐ মুহূর্তে যখন বঙ্গবন্ধুর জীবিত দু'কন্যার প্রয়োজন ছিল নিরাপদ আশ্রয় ও সান্ত্বনা তখন রাষ্ট্রদূত সানাউল হকের অমানবিক আচরণে তাঁরা রাষ্ট্রদূতের বাসভবন ত্যাগ করতে বাধ্য হন।

মানুষের ভাগ্য উন্নয়নে একের পর এক পদক্ষেপ নিচ্ছেন। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের পর শেখ হাসিনার স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের মাঝে দেশে গণতন্ত্র ও উন্নয়নের যে অঙ্কুরোদগম ঘটে তা বিগত চারদশকে এখন পরিপূর্ণভাবেই দৃশ্যমান।

হাজারো প্রতিবন্ধকতা মোকাবিলা করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রশাসন যেভাবে বঙ্গবন্ধু হত্যাকারী ও মুক্তিযুদ্ধে নিরপরাধ মানুষ হত্যাকারীদের বিচার নিশ্চিত করা থেকে শুরু করে গৃহহীন মানুষের আবাসন ও বহুমুখী উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা করছেন, যেভাবে তথ্য প্রযুক্তি সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তুলেছেন, যেভাবে কোভিড ১৯ মহামারী মোকাবিলা করেছেন ও যেভাবে ষোল কোটি মানুষের দেশকে এগিয়ে নিয়ে চলেছেন তাতে মনে হয় রবীন্দ্র উচ্চারণ 'পারবে না কেউ রাখতে আমায় ধরে' তাঁর চলার পথের প্রাণশক্তি। বিশাল রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীকে আশ্রয় প্রদানের মাধ্যমে বৃটিশ গণমাধ্যম কর্তৃক 'মানবতার জননী' অভিধায় স্বীকৃতি পাওয়া মানবপ্রেমে সিক্ত শেখ হাসিনার পক্ষেই সম্ভব।

বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস ১০ই জানুয়ারি ১৯৭২। সেদিন তিনি রমনার রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমানে সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) জনতার উদ্দেশ্যে বলেছিলেন, "স্বপ্ন আমার সফল হইয়াছে। বাঙালি এবার হাসিবে, খেলিবে–এ স্বাধীনতা আর কেউ হরণ করতে পারিবে না।" (ইত্তেফাক, জানুয়ারি ১১, ১৯৭২)। বাংলাদেশের উন্মেষলগ্নে বঙ্গবন্ধুর এ আশাবাদ আমাদের জন্য দিগ্‌নির্দেশনা। শেখ হাসিনা

পৃথিবীতে ভালোমন্দ, আলোআঁধার, সাদাকালো, সত্যমিথ্যা, শান্তিসংঘর্ষ সর্বদাই সমান্তরালভাবে পরিলক্ষিত হয়। এক রাষ্ট্রদূতের চরম অসংবেদনশীল আচরণের বিপরীতে তৎকালীন পশ্চিম জার্মানিতে বাংলাদেশের তদানীন্তন রাষ্ট্রদূত জনাব হুমায়ুন রশীদ চৌধুরী পরম আন্তরিকতায় শোকস্তব্ধ শেখ হাসিনাসহ সকলকে তাঁর বাসভবনে অভ্যর্থনা জানান। হুমায়ুন রশীদ দম্পতি সেই শোকের মুহূর্তে বঙ্গবন্ধুর জামাতা ও দু'কন্যাকে যেভাবে সান্ত্বনা ও নিরাপত্তা দিয়েছিলেন তা মানবিকতার এক অনন্য দৃষ্টান্ত। পরবর্তীতে শেখ হাসিনা ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের নিবিড় নিরাপত্তার স্বার্থে জনাব হুমায়ুন রশীদ চৌধুরী ভারতের তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীর সাথে যোগাযোগ করেন ও দিল্লী পাঠানোর ব্যবস্থা করেন। শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী মায়ের মমতায় বঙ্গবন্ধু পরিবারের বেঁচে থাকা সদস্যদের যেভাবে নিরাপত্তা বিধান ও সার্বিক সহযোগিতায় দায়িত্ব নিয়েছিলেন তা সংবেদনশীলতার এক উজ্জ্বল উদাহরণ।

শোক ও বেদনার অভিঘাতে জর্জরিত শেখ হাসিনা পঁচাত্তরের অভিশপ্ত পনেরোই আগস্ট থেকে শোক ও সত্যের শক্তিতে ধাবিত হচ্ছেন। শত ঝুঁকি মাথায় নিয়ে বঙ্গবন্ধুবিহীন বাংলাদেশে ফিরে আসার দুঃসাহসী ও দূরদর্শী সিদ্ধান্ত গ্রহণ রবীন্দ্র পঙক্তি 'দুঃখে যেন করিতে পারি জয়' স্মরণে আসে। ১৩১৩ বঙ্গাব্দে রবীন্দ্র রচিত একই কবিতার অপর পঙক্তি 'বিপদে আমি না যেন করি ভয়' শেখ হসিনার জীবনদর্শনেরই যথাযথ প্রতিফলন বলে মনে করি।

১৯৮১ সালের ১৭ই মে তারিখে বৃষ্টিস্নাত অপরাহ্ণে সাড়ে চারটায় নয়া দিল্লী থেকে ঢাকায় পৌছেন শেখ হাসিনা। কুর্মিটোলা বিমানবন্দর থেকে যখন তিনি পৈতৃক নিবাস ধানমন্ডির ৩২ নম্বর সড়কে বঙ্গবন্ধু ভবনের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন তখন লক্ষ লক্ষ মানুষ বিমানবন্দর ও যাত্রাপথের দু'ধারে দণ্ডায়মান। সেদিন ঢাকা শহর পরিণত হয়েছিল 'জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু' স্লোগানের নগরীতে। শেখ হাসিনার ঢাকায় আগমনের সাথে সাথে জনগণের কণ্ঠে এ স্লোগান বাংলাদেশের মানুষকে সেদিন গণতন্ত্রের জন্য ঐক্যবদ্ধ করেছিল। প্রবল বৃষ্টির মাঝে মানিক মিয়া এভিনিউতে তিনি তাৎক্ষণিকভাবে সমবেত জনগণের উদ্দেশ্যে যে ভাষণ দেন তা ছিল গণতন্ত্রের পথে মুক্তির লক্ষ্যে দেশবাসীর প্রতি অভয় বাণী। পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে ১৯৭২ সালের ৮ই জানুয়ারি প্রত্যুষে লন্ডন পৌছে বঙ্গবন্ধু কূটনীতিক মহিউদ্দিন আহমদকে বলেছিলেন 'আর ভয় নেই, আমি এসে গেছি।' পিতা-কন্যার মাঝে কি অদ্ভুত মিল।

স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের প্রাক্কালে আন্তর্জাতিক সাময়িকী নিউজউইককে প্রদত্ত এক সাক্ষাৎকারে শেখ হাসিনা বলেছিলেন যে দেশে ফিরে মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠা ও বঙ্গবন্ধুর অসমাপ্ত কাজ সম্পন্ন করাই হবে তাঁর প্রথম দায়িত্ব। (নিউজউইক মে ১১, ১৯৮১)

শেরেবাংলা নগরের মানিক মিয়া এভিনিউতে শেখ হাসিনা দেশবাসীর উদ্দেশ্যে বলেন "আমি আওয়ামী লীগের নেতা হতে আসিনি। আমি এসেছি মানুষকে শৃঙ্খলমুক্ত করতে। আমি আপনাদের পাশে বোন হিসেবে, কন্যা হিসেবে থাকতে চাই।" কত সহজসরল আন্তরিকতায় বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের কথাই বললেন কন্যা শেখ হাসিনা। বাঙালি জাতিকে শৃঙ্খলমুক্ত করে দেশ স্বাধীন করতেই বঙ্গবন্ধু সারাটি জীবন উৎসর্গ করে গেলেন। মানবদরদি শেখ হাসিনা এবার নিয়ে চারবার প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করে চলেছেন। প্রধানমন্ত্রী হিসেবে কিংবা সংসদে বিরোধী দলের নেতা হিসেবে বা আওয়ামী লীগের সভাপতি হিসেবে সর্বদাই তিনি ১৭ই মে তারিখে প্রদত্ত অঙ্গীকার পূরণের প্রচেষ্টাই করে চলেছেন। বঙ্গবন্ধুর জীবনাদর্শ ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় জারিত শেখ হাসিনা অক্লান্ত পরিশ্রম করে নিষ্ঠার সাথে সাধারণ বাংলাদেশের মানুষের সার্বিক কল্যাণে নিজেকে নিবেদিত করেছেন পরিপূর্ণভাবে।

প্রথমবার ১৯৯৬ সালে সরকার প্রধানের দায়িত্বভার গ্রহণ করে শেখ হাসিনা মোবাইল টেলিফোনের মনোপলি ভেঙ্গে দিয়ে সাধারণ মানুষের কাছে মোবাইল প্রযুক্তির সেবা পৌছে দেন। পরবর্তীতে ইন্টারনেট ব্যবস্থার উন্নতির মাধ্যমে জাতীয় তথ্য বাতায়ন প্রতিষ্ঠা করে প্রত্যন্ত অঞ্চলের জনগণকে যেভাবে সারা পৃথিবীর সাথে সংযুক্ত করেছেন তা বাংলাদেশের অগ্রযাত্রায় এক উজ্জ্বল মাইলফলক।

আমার মনে পড়ে ২০০৯ সালের ডিসেম্বরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪৫তম সমাবর্তনে সমাবর্তন বক্তৃতা দেয়ার জন্য এসেছিলেন তাইওয়ানের নোবেল বিজয়ী রসায়নবিদ অধ্যাপক ওয়াই টি লী। যেদিন অপরাহ্ণে তিনি ঢাকা ত্যাগ করবেন সেদিন সকালে জানালেন যে যখন তিনি যে দেশে যান সে দেশের রাষ্ট্রপ্রধান কিংবা সরকার প্রধানের সাথে দেখা করে শিক্ষা নিয়ে তাঁদের চিন্তাভাবনা জানার একটি কৌতূহল তাঁর মাঝে কাজ করে।

আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাথে দেখা করার সুপ্ত বাসনা তিনি প্রকাশ করলেন। এত সংক্ষিপ্ত সময়ে প্রধানমন্ত্রীর সাথে সাক্ষাতের সম্ভাবনা কম জেনেও আমি প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে যোগাযোগ করি। কিছুক্ষণের মাঝেই প্রধানমন্ত্রীর অফিস থেকে আমাকে জানানো হল যে, তখনই যেন অতিথিকে নিয়ে আমরা প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে পৌছাই কারণ জলবায়ু সংক্রান্ত একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলনে যোগদানের জন্য সেদিন সন্ধ্যায়ই প্রধানমন্ত্রীর ঢাকা ছাড়ার কথা।

অধ্যাপক লী মূলতঃ বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর সাথে কথা বলছিলেন এবং প্রধানমন্ত্রী নতুন প্রজন্মের ছেলেমেয়েদের নিয়ে তাঁর চিন্তাভাবনার কথা উল্লেখ করছিলেন। শিক্ষা খাতের প্রতিটি বিষয়, বিশেষ করে প্রাথমিক পর্যায় থেকে উচ্চ শিক্ষা পর্যন্ত প্রতিটি স্তর নিয়ে যেভাবে তিনি তথ্য পরিসংখ্যানের ভিত্তিতে তাঁর চিন্তাভাবনার কথা বলছিলেন তাতে অধ্যাপক লী অভিভূত ও বিস্মিত। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে বেরিয়ে যখন আমরা হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর অভিমুখে যাচ্ছি তখন অধ্যাপক লী বললেন যে "তোমরা ভাগ্যবান যে এমন একজন প্রধানমন্ত্রী পেয়েছো। আমি বহু দেশে রাষ্ট্রনায়কদের সাথে সাক্ষাৎ করেছি কিন্তু নতুন প্রজন্মের শিক্ষা তোমাদের প্রধানমন্ত্রী নিজে এত স্বচ্ছ, যৌক্তিক ও সংবেদনশীল চিন্তাভাবনা ও এত বিশদভাবে প্রতিটি বিষয় সম্পর্কে অবহিত থাকায় পারঙ্গমতা আমি কোথাও দেখিনি। তোমাদের প্রধানমন্ত্রী শিক্ষাকে যে গুরুত্ব দিয়ে দেখছেন তাতে আমি মনে করি– বাংলাদেশ অতি দ্রুত উন্নয়নের সোপান অতিক্রম করবে।

বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন বাঙালি জাতিকে যেভাবে উদ্দীপিত করেছিল তা স্মরণ করে আজও আমরা রোমাঞ্চ অনুভব করি। বাঙালির স্বাধীনতা সেদিন পূর্ণতা পেয়েছিল। বঙ্গবন্ধুর অবর্তমানে শেখ হাসিনার স্বদেশ প্রত্যাবর্তন বাঙালি জাতিকে আবার নতুন করে পথচলার ক্ষেত্রে দারুণভাবে উদ্বুদ্ধ করেছে। বঙ্গবন্ধু ১০ই জানুয়ারি, ১৯৭২ প্রত্যুষে নয়া দিল্লীতে বলেছিলেন "আমার এ যাত্রা অন্ধকার থেকে আলোর পথে যাত্রা"। দেশরত্ন শেখ হাসিনার স্বদেশ প্রত্যাবর্তনও একইভাবে সামরিক শাসন কবলিত অন্ধকার থেকে দেশকে আলোর পথে নিয়ে আসার অবিরাম সংগ্রামের যাত্রা।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে আজকের এই দিনে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই ও তার দীর্ঘ ও সুস্থ জীবন কামনা করি। তাঁর সুনেতৃত্বে বাংলাদেশ সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়া অব্যাহত রাখবে এই আমাদের প্রত্যাশা।

ওবায়দুল কাদের, এমপি
সাধারণ সম্পাদক
বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ

সাধারণ সম্পাদকের কথা

১৭ মে– আমাদের জাতীয় ইতিহাসের তাৎপর্যময় একটি দিন। অন্ধকার থেকে আলোয় ফেরার দিন। ১৯৮১ সালের এই দিনে প্রাণের মায়াকে তুচ্ছ করে বাংলার ভাগ্যবিড়ম্বিত জনগণকে তার ন্যায্য অধিকার ফিরিয়ে দিতে স্বজন হারানোর বেদনাকে শক্তিতে পরিণত করে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জ্যেষ্ঠকন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা স্বদেশে ফিরে আসেন।

বাংলাদেশের ইতিহাসে দু'টি স্বদেশ প্রত্যাবর্তন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। এর প্রথমটি ১৯৭২ সালের ১০ই জানুয়ারি, প্রায় সাড়ে নয় মাস পাকিস্তানের নির্জন কারাগারের বন্দিদশা থেকে মুক্তি পেয়ে লন্ডন, সাইপ্রাস ও দিল্লি হয়ে স্বাধীন বাংলাদেশ জাতিরাষ্ট্রের স্থপতি ও প্রথম রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন। আর দ্বিতীয়টি, ১৯৭৫ সালের নির্মম ট্রাজেডির পর প্রায় ছয় বছরের শোকবিধুর নির্বাসন শেষে জননেত্রী শেখ হাসিনার স্বদেশ প্রত্যাবর্তন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ফিরে আসার মধ্য দিয়ে মুক্তিযুদ্ধে বাঙালির বিজয় পূর্ণতা পেয়েছিল– যে বিজয়ের ভিত তিলে তিলে তৈরি করেছিলেন তিনি। আর দেশরত্ন শেখ হাসিনার ফিরে আসার মধ্য দিয়ে কূলহারা একটি জাতি খুঁজে পেয়েছিল আপন সত্তায় ফিরে এসে মুক্তিযুদ্ধের আদর্শ, গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার ও সকল অপশাসনের বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়ার শক্তি ও সাহস। সেদিনের সেই প্রতিজ্ঞা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেশরত্ন শেখ হাসিনা অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছেন, বার বার নিজের জীবনকে বিপন্ন করে আমাদেরকে দিয়েছেন একটি সমৃদ্ধশালী বাংলাদেশ। বিশ্বের বুকে একটি মর্যাদাশীল দেশ হিসেবে আমরা মাথা তুলে দাঁড়িয়েছি। সে কারণে এই দিন দু'টি আত্মশক্তিকে জাগিয়ে তোলার জন্য অবশ্য পালনীয় দিন।

বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, পৃথিবীর বুকে বাঙালি জাতি একটি মর্যাদাশীল জাতি হিসাবে এবং সম্মানিত জাতি হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করবে। বঙ্গবন্ধুকন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনার ভিশনারি নেতৃত্ব সেই প্রত্যয়দীপ্ত প্রত্যাশাকে বাস্তবে রূপ দিয়েছে। বঙ্গবন্ধুর আরাধ্য স্বপ্নের সোনার বাংলা আজকের আলোকোজ্জ্বল বাংলাদেশের রূপকার, জনগণের ভালোবাসায় অভিসিক্ত চারবার সফল প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হাত ধরে বাস্তবায়িত হচ্ছে। ১৯৮১ সালে ফিরে এসে তিনি যে লড়াই শুরু করেছিলেন সে লড়াই এখনো চলছে।

জননেত্রী শেখ হাসিনার স্বদেশ প্রত্যাবর্তন নিয়ে ১৯৮১ সালে ৫ই মে বিখ্যাত নিউজ উইক সাময়িকী এক সাক্ষাৎকারে তাঁকে প্রশ্ন করেন–প্রবল স্বৈরাচারী শাসকদের বিরোধিতার মুখে আপনার দেশে ফেরা কি ঝুঁকিপূর্ণ হবে না? উত্তরে তিনি বলেছিলেন, সাহসিকতা এবং ঝুঁকি এই দুই-ই জীবনের কঠিনতম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার শর্ত। প্রকৃতপক্ষে, জীবনে ঝুঁকি নিতে না পারলে এবং মৃত্যুকে ভয় করলে জীবন মহত্ত্ব থেকে বঞ্চিত হয়। ১৯৮১ সালে ১৭ই মে যখন তিনি দেশে ফিরে এলেন সেদিন ছিল ঝড় এবং প্রবল বৃষ্টিপাত। প্রকৃতিও সেদিন শোক-বিহ্বল, স্বজন হারানোর ব্যথায় বিধুর। গোটা ঢাকা শহর বৃষ্টির ঢলে নয়, মানুষের ঢলে ভেসে উঠেছিল। সেদিন তিনি কঠিন চ্যালেঞ্জের মুখে স্বদেশ প্রত্যাবর্তন না করলে উল্টোপথের যাত্রা থেকে এদেশকে মুক্তিযুদ্ধের আদর্শে ফিরিয়ে আনা সম্ভব হতো না। শেখ হাসিনা সে অবস্থা থেকে বাংলাদেশকে রক্ষা করেছেন এবং বাংলার মানুষকে মুক্তিযুদ্ধের অসাম্প্রদায়িক চেতনায় অভিষিক্ত করেছেন। এ তাঁর এক অনন্য গৌরবগাথা।

দেশরত্ন শেখ হাসিনা তাঁর রাজনৈতিক লক্ষ্য ও উন্নয়নের দর্শন সম্পর্কে বলেছেন, 'রাজনীতিতে মৌলিক পরিবর্তন আনতে হবে... রাজনৈতিক দলগুলোর প্রতিযোগিতা হবে অর্থনৈতিক কর্মসূচি নিয়ে। সামাজিক কর্মসূচি নিয়ে... কে কত ভালো কর্মসূচি দিতে পারে। কোন দলের কর্মসূচি অর্থনৈতিক মুক্তি অর্জনে বেশি ফলপ্রসূ জনগণ তা বিচার করার সুযোগ পাবে। আন্দোলন হবে সমাজ সংস্কারের জন্য, অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য। আর এ উন্নয়ন মুষ্টিমেয় মানুষের জন্য নয়। উন্নয়ন হতে হবে বৃহৎ জনগোষ্ঠীর জন্য এবং রাজনীতি হবে গণতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষ এবং সামাজিক অগ্রগতির প্রধান চালিকাশক্তি।'

বঙ্গবন্ধু যে সোনার বাংলার স্বপ্ন দেখেছিলেন, সেই স্বপ্ন-ই আজ বাস্তবায়িত হয়েছে তারই সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে। তাই সঙ্গত কারণেই আজকে প্রশ্ন ওঠে ১৯৮১ সালের ১৭ মে যদি তিনি ফিরে না আসতেন তাহলে কি আমরা আজকের এই বাংলাদেশ পেতাম? তিনি সেদিন ফিরে না এলে আজকের বাংলাদেশ কি বিশ্বের বুকে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারতো? তিনি সেদিন স্বদেশের মাটিতে না এলে মানুষ কি ফিরে পেতো তার গণতান্ত্রিক অধিকার?

আজকের এদিনে আমাদের নিজেদের কাছেই বারবার এই প্রশ্নটি করতে হবে। তাহলেই আমরা উপলব্ধি করতে পারবো– শেখ হাসিনা আজকে শুধু একটি নাম নয়, একজন প্রধানমন্ত্রী নন– শেখ হাসিনা আজকে একটি বিশ্বাসের নাম। শেখ হাসিনা আজকে একটি প্রত্যয়ের নাম। একটি সংগ্রামী অভিযাত্রার নাম।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

ওবায়দুল কাদের, এমপি
সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ